কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

মূল: সামি আলহায
ভাষান্তর: মুহসিন আব্দুল্লাহ
সম্পাদনা: টিম প্রজন্ম

কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

মূল: সামি আলহায

পরিচালক

পাবলিক লিবার্টিজ এন্ড হিউম্যান রাইটস বিভাগ, আল জাজিরা

ভাষান্তর: মুহসিন আব্দুল্লাহ

প্রজন্ম

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

facebook.com/projonmopublication

www.projonmo.pub

কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৮

২য় সংস্করণ
জুলাই ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
দোকান নং: ০৪, ২য় তলা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

মূল্যঃ ২৩৫ [দুইশত পঁয়ত্রিশ] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Koyedi 345 by Sami Al-haj, Translated by Mhsin Abdullah, Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
Price: 235 Taka , 10 US$
ISBN: 978-984-34-6697-6

লেখক পরিচিতি

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালে সুদানের খার্তুমে জন্ম নেয়া সামি আলহায কাতার ভিত্তিক বহুল পরিচিত গণমাধ্যম 'আল জাজিরা'র সাংবাদিক। আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের ভয়ংকর হামলার ফুটেজ তিনিই সর্বপ্রথম ধারন করেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ২০০১ সালে সহকর্মীদের নিয়ে আফগানিস্তানে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে আটক হন। এরপর তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। তার বিরূদ্ধে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের ভিডিও চিত্র সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয় যদিও তিনি শুধু আল জাজিরার পক্ষে তৃণমূল সাংবাদিকতা ও ভিডিও চিত্র সংগ্রহের কাজ করছিলেন। আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন বন্দি রেখে পরবর্তীতে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি ছয় বছর বন্দি ছিলেন।

ছয় বছর অবর্ণনীয় নির্যাতন আর সীমাহীন কষ্ট ভোগের পর ২০০৮ সালের পহেলা মে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন। ব্রিটিশ মানবাধিকার আইনজীবী ক্লাইভ স্টাফোর্ড স্মিথ আলহাযের পুরো বন্দি অবস্থায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। ক্লাইভ ২০০৫ সালে তার সাথে দেখা করার সুযোগ পান। স্টাফোর্ডের মতে সামি বন্দি অবস্থায় ভয়ংকর শারীরিক মানসিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং ধর্মীয় নিগ্রহের মুখোমুখি হন। বেধড়ক মারধরের কারণে মুখে দাগ বসে যায়। স্টাফোর্ড আরো জানান যে সামি নিজ চোখে আফগান সেনাঘাটিতে মার্কিন সেনাদের কুরআন টয়লেটে ছুড়ে ফেলতে দেখেছে। কুরআনের গায়ে অশ্লীল কথা লিখে রাখতে দেখেছে। ২৩ নভেম্বর ২০০৫

সালের এক জিজ্ঞাসাবাদে সামিকে মার্কিন কর্মকর্তারা জিজ্ঞেস করে আল জাজিরা আল কায়েদার অঙ্গসংগঠন কিনা।

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে গুয়ান্তানামো কারাগারে মার্কিন সেনাদের বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন তিনি এবং আরো কয়েকজন সহকয়েদী। সেসময় তার ৫৫ পাউন্ড ওজন কমে যায়। অনশন ভাঙ্গাতে তাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হতো। সে ফোর্স ফিডিং ছিল আরেক অত্যাচার। সামির অনশন চলে টানা ৪৩৮ দিন। তার মুক্তির দিন পর্যন্ত।

অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সামি এখন আল জাজিরার প্রধান কার্যালয়ে 'পাবলিক লিবার্টিজ এন্ড হিউম্যান রাইটস' বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। যেখানে তার কাজ হলো মানবাধিকার সংক্রান্ত, যৌন নিপীড়নমূলক সংবাদের তদারকি করা এবং সে সংবাদগুলোকে টিভির পর্দায় নিয়ে আসতে কিংবা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে পৌছতে যাবতীয় এন্তেজাম করা।

সামি আলহাজ সাংবাদিকতায় AIB INSI Special Award এবং Reporter of the year Viareggio পদক পান।

প্রকাশকের কথা

২০০১ সাল। আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের আক্রমণ শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকদের কাজ হলো এতো বড় ঘটনা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। সামি আলহায ছিলেন বহুল পরিচিত গণমাধ্যম 'আল জাজিরা'র ফটোজার্নালিস্ট। অফিস থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের হামলার খবর কভার করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সামিকে। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশের পথে আটকে গেলেন তিনি।

নানা নাটকীয়তার পর পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী তাকে মার্কিন বাহিনীর কাছে তুলে (কিংবা বিক্রি করে) দেয়। আফগানিস্তানে অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক সামি আলহাযকে স্বাগত জানায় মানবতাবাদী (!) মার্কিন সেনারা।

আফগানিস্তানে ভয়ংকর নির্যাতনের পর পাঠানো হয় কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগারে। মানবতাকে পদদলিত করে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়। নূন্যতম মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। একে এক জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হয় ছয় ছয়টি বসন্ত। অতঃপর বলা হয়, "আমরা সত্যিই দুঃখিত, তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।"

মুক্তির পর সামির বন্দিজীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা–নিজের মুখেই বর্ণনা করেছেন। হৃদয়ভাঙ্গা সে ব্যথাতুর বিবরণ আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। স্মৃতির সেই স্রোতধারা পৃথিবীময় প্লাবিত হয়।

সামি আলহায একজন অকুতোভয় সাংবাদিক। তাকে আমেরিকা বন্দি করেছিল ঠিকই কিন্তু তার মনকে বন্দি করার সক্ষমতা ছিল না কারো। সামিকে বন্দি করেছিল ঠিকই কিন্তু হার মানাতে পারেনি।

'কয়েদী ৩৪৫' শুধু একটি বই নয় এটি একটি জীবন্ত ইতিহাস। বছরের পর বছর ধরে চেপে রাখা এক মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন। সামির সাহস পথ দেখাবে আগামী প্রজন্মকে। সামির লেখনি শক্তি যোগাবে লাখো সাংবাদিককে নির্ভিক হতে।

সামি আলহাযের আইনজীবী ক্লাইভ স্ট্যাফোর্ড স্মিথের একটি মন্তব্য, "গুয়ান্তানামো কারাগারের একজন মেধাবী এবং সাহসী কয়েদীকে মক্কেল হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার দীর্ঘদিনের। সামির কাজ যেন পশুদের উদর ফুরে বের হওয়া কোন সৃষ্টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সযতনে লুকিয়ে রাখা এক মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন। গত পনেরটি বছর ধরে লুকিয়ে রাখা ভয়ানক এক কারাগার সম্পর্কে সবচেয়ে নিখাদ বর্ণনা। ঘটনাবহুল সে দিনগুলোর বর্ণনা বিশ্ববাসীর সামনে সবিস্তারে তুলে ধরা উচিৎ।"

পরিচালক,
প্রজন্ম পাবলিকেশন

সূচীপত্র

পূর্বকথা ১১
রাতের পাখি ১৪
গুয়ান্তানামো, কষ্টের দ্বীপ.....১৬
'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র সংবাদ সংগ্রহ ২৬
"আমরা জানি এটা একটি ভুল".....৩৬
ওমর আল কেনেডি (ওমর খেদর).....৪৭
বাগরামে আমি.....৪৯
বাগরাম থেকে কান্দাহার ৬২
আফগানি এক বৃদ্ধ ৭১
কান্দাহারে জিজ্ঞাসাবাদ ৭২
গুয়ান্তানামোতে প্রথম দিন.....৮১
সুদানি ভাইয়েরা ৮৬
সেল নম্বর ৪০.....৮৮
"আমাদের হয়ে কাজ করো" ৯৫
আবু শায়মা, আবু শিফা ১০৫
প্রথম রমাদান ১১১
একাকী কয়েদী ১১৭
পাপা, ফক্সট্রট ও মাইক.....১২৩
বসে থাকা.....১২৮
বিচার ১৩২
ক্লাইভ.....১৩৯
তালাল ও ইয়াসির আল জাহরানি.....১৪৩
সহকয়েদীর মৃত্যু ১৪৫
শক্তিশালী অস্ত্র ১৪৯
মুহাম্মদ আল-আমিন আল শিনকিতী.....১৫৪
আমার অনশন ১৫৬
অবশেষে মুক্তি.....১৬১
শেষ কথা ১৭১

পূর্বকথা

বইটি যখন লিখতে বসি, আমাকে নীরব লেখকের মতো ভেবে আকুল হতে হয়নি যে কী লিখব...? গুয়ান্তানামো কারাগারে বসেই এ ভাবনা আমি ভেবেছি। অজস্র ঘণ্টা আমার সেলে বসে ভেবে ভেবে কেটে গেছে। আমি আমার সেই ছয় বছরে যা জানতাম না তা হলো, 'আমি আসলে একা নই'। আমার চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান 'আল জাজিরা' প্রায়ই আমার নাম আর বিচারকাজ জনগণের সামনে তুলে ধরত। তারা একটা খবর প্রচার করত আর মুহূর্তেই তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। টিভির স্ক্রলে ভাসত "সামি আলহাযকে মুক্তি দাও"। দর্শকরা আমার দুর্দশার খবর জেনে যেত।

আমি সত্যিই এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাকে তারা নিজের সন্তানের মত ভেবেছেন। বিচারকার্য চলাকালে আমার পাশে থেকেছেন। আমার মামলার দিকে বিশ্ববাসীর নজর নিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর চৌদিকে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা, এনজিও গুলোকে তাগাদা দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

কিছু মানুষ আছেন যাদের নাম পরিচয় ধরেই ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথমেই আমার স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদের কথা না বললেই নয়। যিনি আমার মুক্তির জন্য ক্লান্তিহীন কাজ করেছেন এবং বিশ্বাস করতেন আমি একদিন পরিবারে ফিরবই।

একই সাথে বলব আল জাজিরা পরিবারের মধ্যে সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল ওয়াদাহ খানফারের কথা। যিনি সকল কর্মসূচী বাদ দিয়ে আমার মুক্তির পর খার্তুম বিমানবন্দরে আমাকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এরপর বলব ড. ফাওজি ওয়া সাদিকের কথা। যিনি হিউম্যান

রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য নাগরিক ও সুশীল সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় করেছেন। সুদানের হাসান সাঈদ আল মুজাম্মার যিনি জনকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত, অফুরন্ত সমর্থন জুগিয়েছেন, আইনি বিষয়গুলো দেখভাল করেছেন।

ফ্রান্সের মানবতাবাদী সংগঠন The International Office of umanitarian and Charitable Organisations (IOHCO) আমার পক্ষে কাজ করেছে। ড. হাইথাম এবং অ্যানা নিজে গুয়ান্তানামো কারাগার সফর করেছেন এবং প্রশাসনকে আমার নিরপরাধ হবার ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন যা আমার মামলার নথিপত্রের জটিলতা কমিয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের মানবতাবাদী সংগঠন 'আলকারামা'ও আমার পক্ষে কাজ করেছে। বিশেষ করে ড. রশিদ মেসলি যিনি উক্ত সংগঠনের আইন বিষয়ক পরিচালক। কুয়েতের আদিল জসিম আল দামাকি যিনি Kuwaiti Association for the Basic Elements of Human Rights প্রধান, আমার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আরো আছেন, খালিদ আল আনাসি যিনি ইয়েমেনের National Organization for Defending Rights and Freedoms (HOOD) এর নির্বাহী পরিচালক এবং আসিম কুরেশী যিনি লন্ডনের মানবাধিকার সংগঠন CAGE (কেইজ)'র প্রধান।

আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই আল জাজিরার আইনজীবীদের, সুদানি আইনজীবী সমিতি এবং মানবাধিকার সংগঠন, এনজিওগুলোকে যারা ক্লান্তিহীনভাবে আমার মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। আমি সেসব মানুষদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা ব্যানার নিয়ে খার্তুমের মার্কিন এম্বেসীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুক্তি দাবি করেছেন। বিশ্বাস করেছেন, 'আমি নির্দোষ'। সুদানের মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, দক্ষিণের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গ্রুপ, খার্তুমের মানবাধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন কেন্দ্র, সুদানের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ, হোপ সেন্টার, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সেইসব প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশা জিইয়ে রেখেছিলেন। আমার পরম আরাধ্য সাংবাদিকতার কাজে আবার নিয়মিত হতে পারি সে চেষ্টা

করেছেন তাদের প্রতি আমি ঋণী। আমি সেসব লোকদের প্রতিও কৃতজ্ঞ যারা আমার কারণে ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

প্রতিটি হৃদস্পন্দনে আমি 'আল জাজিরা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 'আল জাজিরা' আমার জন্য স্নেহস্পর্শী, বটবৃক্ষ পিতার মত ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য সংস্থা ও সংগঠনগুলো মায়ের মত ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বজুড়ে আমার মুক্তির জন্য কাজ করা মানুষেরা আমার ভাই বোন।

আপনাদের সবার প্রতি আমার স্মৃতির ডালি সমর্পণ করছি। যার ভিতর রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে অমানবিক কারাগারে কাটানো আমার ছয় বছরের অভিজ্ঞতা। কোন কারণ ছাড়াই আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোন ন্যায়বিচার করা হয়নি। আমি সেখানে ছিলাম হতভম্ব, যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ধুকে ধুকে মরছিলাম। যতদিন না কারা কর্মকর্তারা আমাকে মুক্তি দেবার মত সুস্থতায় নিয়ে আসে। আমার স্মৃতির খেরোখাতার আঁকিবুকিতে ভুল হলে ক্ষমা করবেন। আমি আমার চিন্তা, আবেগ প্রকাশ করেছি। নিজেকে হালকা করেছি। এমন এক জিঞ্জিরজটলার বর্ণনা দিয়েছি যার ভিতর শুধুই লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি লাভ করেছি অর্ন্তদৃষ্টি, প্রশান্তি আর মানসিক শক্তি। আমার সংক্ষুব্ধ মনের অস্থিরতা কাগজের উপর বর্ণ হয়ে নেমেছে। এখন আমি স্থির। আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আরো বেশি সহিষ্ণু। আমি এখন এই নিঝুম আরব্য রজনীর বন্ধুর চেয়েও বেশি। ভালোবাসার শহর দোহা এখন আমার আরো ঘনিষ্ট সঙ্গী।

রাতের পাখি

রাতের গহীনে আমি একা। নিজের নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। হৃদস্পন্দন হচ্ছে আমার। মৃদু বায়ু বইছে। হালকা আলোর রেখা মাথার উপর। আরব সাগরের শা-শা ঢেউয়ের শব্দ কানে ভেসে আসছে। মনে পরছে এরকম আরো অনেক সাগরের ঢেউয়ের স্মৃতি। কত বিস্ময়কর এই সাগর!

একটি রাতের পাখি আমার পাশে উড়ে এসে বসল। ক্ষীণস্বরে গান গেয়ে যাচ্ছে। যেন এক হারানো সঙ্গীর শোকে কাতর। আমি জানি না এই পাখির নাম কী। অন্ধকারে এর আকৃতি বুঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এর সকরুণ সুর আমাকে গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে দেয়।

গুয়ান্তানামো। গুয়ান্তানামো আমার গল্প। আমি কয়েদী নম্বর ৩৪৫। গুয়ান্তানামো আমার গল্প। আট শতাধিক কয়েদীর গল্প। অধিকাংশ যারা সেখানে দিনগুজরান করেছি আমাদের গল্পগুলো প্রায় একই। আবার অন্য দিক থেকে গল্পগুলো ভিন্ন ভিন্ন। আমার স্মৃতিতে ভাসে নিদারুণ কষ্ট আর নির্যাতনের সেই দিনগুলোর কথা। পাষাণ হৃদয় আর পাথর আকৃতির পুরুষ ও নারী সেনাদের কথা। তারা আমার জীবনের সেরা দিন, মাস ও বছরগুলোকে পিষে ফেলেছে। একটুও বাঁধেনি তাদের বিবেকে!

কিন্তু আমি তাদের পরাস্ত করতে পেরেছি। আমি আমার শপথ দিয়ে তাদের পরাজিত করেছি। যে শপথ আমি করেছি স্বয়ং আল্লাহর অদৃশ্য হাতে। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন যেখানেই আমরা থাকি না কেন। তিনি আছেন রাতের গহীনে। আছেন প্রলম্বিত দ্বি-প্রহরগুলোতে। তিনিই আমার মা'বুদ যিনি আমাকে কষ্ট বইতে সাহস যোগান। যতক্ষণ চেতন থাকে ততক্ষণ তাঁর রহম অনুভব করি।

আমার মাঝে আমি এক প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করলাম। মনের সে শক্তি সুপ্ত থাকে। আবার প্রয়োজনে জেগে ওঠে। আমাদের সবার মাঝেই সে শক্তি ছিল। শত ঝড় ঝাপটা উপেক্ষা করেও সে শক্তি জাজ্বল্যমান ছিল। এই শক্তির স্ফুলিঙ্গ সেদিন থেকে জ্বলতে শুরু করে যেদিন থেকে আমার ক্ষুধার্ত দেহ কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সত্ত্বা নিয়ে কারাজীবনের শুরু। গভীরভাবে ভাবি জীবনগতি। এরপর সিদ্ধান্ত নিই।

আমি অনশনে যাই। আমার প্রতি অন্যায় আটকাদেশের প্রতিবাদ করি। অনড়-অটল থাকি। অবিচল থাকার শক্তি আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা আমার হৃদয়ে ঢেলে দেন। কি রকম অটল ছিলাম গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুর কারারক্ষীরা তা জানে।

সেই অন্ধকার দিনগুলোতে ইসলামের মহান হিরোদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তগুলো আমার মনে পড়ত। বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) যাকে মক্কায় মরুভূমিতে ফেলে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার মনের চোখ দিয়ে তাকে দেখেছি। পাথর চাপায় পিষ্ট তিনি। ক্ষীণস্বরে আল্লাহর প্রতি ঈমান জানান দিচ্ছিলেন; 'আহাদ', 'আহাদ'।

আমি দেখেছি মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) কে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বাম হাত দিয়ে পতাকা উড্ডীন করে রেখেছেন তার ডান হাত কেটে নেয়ার পর। এরপর বাম হাত কেটে নিলে খণ্ডিত দুই হাতের উপরের অংশ দিয়ে বুকে চেপে ধরেন পতাকা। আমি খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বগাঁথা স্মরণ করি। যার দেহে অসংখ্য তলোয়ার-কাটা, তীর-বিধার চিহ্নে ভরা ছিল। এক ইঞ্চি পরিমান চামড়াও পরিষ্কার ছিল না। মনের চোখ দিয়ে তাদের দেখেছি। প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে পেয়েছি।

আমার মন, তুমি আনমনা হয়ো না! এখনও দোহায় বসে আমি সেই কাটাতারের বেড়া, অস্ত্রের ঝনঝনানি, হিংস্র কুকুরের গর্জন, রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের স্মৃতি মনে করতে পারি। ব্যথার গোঙানী এখনও কানে বাজে। এখনও স্মৃতিতে ভাসে যন্ত্রণার সেই কারাগার গুয়ান্তানামো।

সেখানে জেলার আমাকে একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করে। নগ্ন করে ফেলে। সংকীর্ণ এবং ফ্রীজের মত ঠাণ্ডা সে কারা প্রকোষ্ঠ। এখন স্মরণ করে অবাক হই কিভাবে সেদিন আমাকে একটি কক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। প্রচণ্ড শীতে থরথর কাঁপছিলাম আমি। ডান পাশের কক্ষ থেকে একটি ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছিল। 'আহাদ','আহাদ'।

কিছুক্ষণ পর, আমার বাম পাশের প্রকোষ্ঠ থেকে একজন কয়েদী বলছে, "সামি! বিলাল রা. এর সেই স্মৃতি বুকে ধারণ কর দেখবে শীত চলে গেছে।" আমি হেসে দিলাম। এতকিছু সত্ত্বেও আমি হেসে দিলাম। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ভাষায়, "পরাজিত হবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। একজন মানুষ ধ্বংস হতে পারে কিন্তু পরাজিত নয়।"

গুয়ান্তানামো: কষ্টের দ্বীপ

রাতের পাখিটি জানালার পাশে এসে বসে। আরব্য রজনীর গান ধরে।

কোমল হাত স্পর্শ করে আমাকে। "সামি, কেন তুমি এখনো বসে আছো? কেন জেগে আছো? কিছু ঘটেছে?" মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে আমার স্ত্রী। যার সযতন পরিচর্যায় গত কয়েক বছর ধরে চলা নির্যাতনের ক্ষতগুলো সেরে উঠেছে।

"না তেমন কিছু না" বললাম। আমার পরিবারের সাথে থাকতে পেরে আমি সুখী। স্মরণ করার চেষ্টা করছি ভয়ানক সেই দিনগুলোর কথা। যে দিনগুলো শুধু আল্লাহর বিশেষ সাহায্য নিয়েই কাটিয়েছি।

"হুমম... কিন্তু তোমাকে তো কিছু লিখতে দেখছি না। আল্লাহ তোমাকে সেই কষ্টকর দিনগুলো স্মরণ করার তাওফিক দিয়েছেন। তাই তোমার উচিত সে দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত লিখে রাখা।"

"যথার্থ বলেছ, আমার প্রিয়তমা।"

সে চলে গেল। ফিরে এলো কাগজ কলম নিয়ে। আমার সামনে সেগুলো রাখল। পাশে বসল। আমি লিখতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং চলে গেল।

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি কখনো শীতের রাতে নগ্ন অবস্থায় খসখসে মেঝেতে শুয়েছেন?

এভাবে (বিছানাপাতি, পোশাকাদি ছাড়া, উলঙ্গ অবস্থায়) রাতের পর রাত কাটানোর চেষ্টা করেছেন?

এমন দিন কল্পনা করেছেন? যেখানে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত দুঃস্বপ্নের মতো। দেখা মেলে দৃশ্য অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের। চারটা করে প্রেতাত্মা একসাথে আসত। মনের খায়েস না মেটা পর্যন্ত থাকত সেখানে।

আমাদের অনেকেই গুয়ান্তানামোতে আশা হারিয়েছেন। নিয়মিত নির্যাতনই নিয়তি-মেনে নিয়েছেন। অবশ্য আমি আশাহত হইনি কখনো। যদিও মাঝেমাঝে হতাশা গ্রাস করত।

গুয়ান্তানামো আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল বিশেষ করে সেসব মানুষদের যারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, পদে নিয়োজিত ছিল। যাদের সমাজে সম্মান ও অভিজাত পরিচিতি রয়েছে। উঁচুস্তরের মানুষ- যারা অসংখ্য পরিবার দেখাশোনা করতেন, পিতা- যারা সন্তানদের লালন পালন করতেন, সুশিক্ষা দিতেন অথবা যুবক- যারা তাদের পরিবারের জন্য গর্বের কারণ হতে যাচ্ছিল তাদের সবাই গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুর বুলডোজারে পিষ্ঠ হয়েছে। সীমাহীন অত্যাচার আর অদ্ভুত কৌশলের জিজ্ঞাসাবাদে বিপর্যস্ত হয়েছে।

একবার গুয়ান্তানামোতে থাকাকালীন, আমার আইনজীবী আমাকে মামলার নথিপত্র পড়তে দেয়। আমি সেখানে একটি মার্কিন সামরিক কর্মসূচী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম। 'টিকে থাকা, এড়িয়ে যাওয়া, প্রতিরোধ, পলায়ন' ধাপগুলো তৈরি করা হয়েছে যখন তারা শত্রুর হাতে আটক হয় তখনকার করণীয় সম্পর্কে। যদিও সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য করা হয়েছে কিন্তু আমার জন্যও খারাপ হবে না।

নির্যাতন প্রশিক্ষাণার্থী এক সেনাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে প্রতিরোধ হলো ধর্মকে অবজ্ঞা করা। নিজেরা কয়েদী হলে যেমন এ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তেমনি নিজেদের হাতে কয়েদীদের উপরও তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সে শাস্তিতে ধর্মীয় প্রতীকসমূহকে অপদস্থ করে কয়েদীদের মানসিকভাবে বিধ্বস্থ করা হয়। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণার্থীদের বাইবেলের বক্তব্যকে বিকৃত করে নির্যাতন করত। চিৎকার করে বলত, "তোর প্রভূর উপর অভিশাপ! যীশু খ্রীস্টের উপর অভিশাপ! প্রভুরা অপদার্থ!"

প্রশিক্ষকরা কারা কক্ষগুলোতেও ঝড় তুলত। খাবার প্লেটে লাথি মারত। প্রশিক্ষাণার্থীদের ভয় দেখাতে চোখে তীব্র আলোর লাইট মারত। একই কাজ আমাদের সাথেও করা হতো। তবে আমাদের বেলায় ট্রেনিং শেষে কলিগদের সাথে ভরপেট খাবারের আয়োজন থাকত না। গুয়ান্তানামোতে আমাদের উপর এসব ট্রেনিং ম্যানুয়ালের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতো।

গুয়ান্তানামোর দুটো অনুভূতির স্মৃতি আজো স্মরন করতে পারি। ১. ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া ২. প্রচণ্ড শীত

জেলাররা এয়ার কন্ডিশন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় দিয়ে রাখত এমনকি তা ফ্রীজের মাত্রার চেয়েও নিচে নেমে যেত। শীতে থরথর কাঁপতে থাকতাম।

একটি অন্তর্বাসও ছিলনা শরীরে। আমি সুদানের প্রখর তাপে বেড়ে উঠেছি। শীত আমার জন্য সত্যি সত্যি অত্যাচার ছিল।

বেলাল রা. এবং ইতিহাসের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবন স্মরণ করতে থাকি। তাদের জীবন আমাকে অভাবনীয় শক্তি যোগায়। এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু স্বাভাবিক অনুভব করি-যেন সরাসরি আল্লাহর সাহায্য। প্রচণ্ড শীতেও দেহের প্রতিটি কোষে উষ্ণতা ছুঁয়ে যেত। আমি অতিরঞ্জন করছি না, আল্লাহর কসম। আমার কক্ষ মাঝে মাঝে দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত উষ্ণ থাকত।

যদি আমি তখন কিছু বলতে পারতাম আমি বলতাম যেমনটা ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন যে, "মানুষ এমন সৃষ্টি যাকে জয় করা যায় না।" আমি আরো যোগ করে বলব, "হৃদয় যার ঈমানী চেতনায় ভরপুর থাকে সে সবকিছু সইতে পারে, সবকিছু।"

প্রহরীরা গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বিদ্বেষ বসত আমাদের রাতদিন ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করত। তারা দাঙ্গাবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের প্রকোষ্ঠগুলোতে অত্যাচারের ঝড় তুলত। সাতজন সেনা দেহবর্মীতে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের এখানে চলে আসত কোন কারণ ছাড়াই। নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকত আর উল্লাস করতে থাকত। আরো ভয়ংকরভাবে পেটাত তাদের যারা একটু ন্যায়বিচারের অধিকার রাখে, অধিকার চাইত।

আটজনের একটা গ্রুপ আসত টিয়ারগ্যাসের পাত্র নিয়ে। আমরা তাদের বলতাম পিপারম্যান। একজন সামনে এগিয়ে আসত। প্রথমে নরম সুরে কথা বলত। এরপর হঠাৎ পাত্রের মুখ খুলে আমার দিকে পিপার স্প্রে করত। যখন আমি চোখ বন্ধ করে ফেলতাম বা ব্যথায় মুখ ঘুরিয়ে নিতাম তখন বাকি সাত জন আমার হাত পা ধরে বাথরুমের গামলায় মুখ চুবাত। এরপর আবার পেটাত। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সাত জন সশস্ত্র মানুষ দেখে আমার মনে কোন ভীতি কাজ করত না বরং তারাই আমাকে যেন ভয় পেত। তাদের পিটুনির কারণ মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাদের ভীতিকর কর্মকাণ্ড, ব্যথা আর শরীর যে ভঙ্গুর অবস্থায় রেখে যেত, সহ্য করা যেত না।

তাদের আরেকটি অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র দেখা যেত না। কিন্তু মনের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করত। সে অস্ত্র শরীরে জমা ময়লা পরিষ্কার করতে না পারার

বেদনা। আমাদের শরীরে জমা ময়লা আমাদের শুদ্ধচারিতা ধ্বংস করে দিত। পানি বন্ধ করে দিয়ে সে ধ্বংসগঙ্গায় জোয়ার আনত। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা একটি স্বপ্নের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল তখন। মনে হতো এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রই আমাদের ঈমান আবর্জনায় মিশে যাবে (কারণ পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ)। দেহের ময়লায় খুবই বিরক্ত ছিলাম। এই নির্মমতা আমাদের হীনবল করে দিয়েছিল।

আমার অনশন ধর্মঘট চলাকালে, প্রায়ই তারা আমাকে ফিডিং টিউব দিয়ে জোর করে খাওয়াত। আমি বমি করে ফেলে দিতাম। আমাকে হেনস্থা করতে সেনারা আমার রুমে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেয় যাতে আমি সে বমি, বমিমাখা কাপড় পরিষ্কার করতে না পারি। দীর্ঘদিন আমাকে সে কাপড় পরে থাকতে হয়েছে। দীর্ঘদিন সে বমি, বমিমাখা খাবার আর ফ্রীজের মত ঠাণ্ডা শীতে রাত কাটাতে হয়েছে।

যদি আমাকে নির্বাচন করতে বলা হয় পরিবার বা আইনি সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা শারীরিক মানসিক নির্যাতন কোনটি বেশি কঠিন? আমি বলব, বিচ্ছিন্নতা। এমনকি এটা ওদের বিকৃত মস্তিষ্ক কর্মকর্তাদের বিকৃত যৌন সহিংসতা থেকেও ভয়ংকর। জেলাররা আমাকে প্রথমেই আমার পরিবারে সাথে যোগাযোগ করতে বাধা দেয়। আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলাম। নিঃসঙ্গতা আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। গুয়ান্তানামোতে সৈনিকরা নিত্য নতুন খাবার মেন্যুর মত নির্যাতন স্টাইল নিয়ে হাজির হতো কয়েদীদের সামনে। অফিসাররা অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে সৈনিকরা শুরু করে দিত নির্যাতন। অনেকেই এসব সেনা অফিসার ও সৈনিকদের বিচারের সম্মুখীন করাতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক গুয়ান্তানামো ভ্রমণ করে মন্তব্য করেছেন, "এই জায়গাটি সত্যিকারের নরক।"

সত্যিই এটা নরক। এটা এমন এক নরক যেখানে ঘৃণার দাবানল জ্বলে দাউদাউ করে। পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় কুৎসিত মানবদের (যদিও ওরা তা বুঝতে পারে না)। এটা এমন এক নরক যেখানে পাগলা কুকুরের মত ঘেউঘেউ করা সেনারা আমাদের দিনরাত পাহারা দেয়। এটা এমন এক নরক যেখানে দুর্ব্যবহার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদেরকে পশুর মত টেনে হিচঁড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। হাতে পায়ে শিকল পড়িয়ে লোহার খাচার ভিতর ছুঁড়ে ফেলা হতো। সাধারণ ইটের

মেঝেতে আমরা পরে থাকতাম। আমেরিকার এই জঘন্য কয়েদখানার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ধরন সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত।

গুয়ান্তানামো কিউবার দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ১১৬.৫৫ বর্গকিলোমিটারের একটি মার্কিন নৌ ঘাটি। কোন কোন সূত্র মতে, আমেরিকা ১৮৯৮ সালে কিউবার হয়ে স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জায়গাটি দখল করে। স্প্যানিশরা তখন কিউবাকে শাসন করত। অন্য সূত্রগুলোর মতে, কিউবা ১৯০৩ সালে গুয়ান্তানামো জায়গাটি আমেরিকাকে উপহার দেয় স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে। জায়গাটির বার্ষিক ভাড়া ছিল তখন প্রায় দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বা ৪ হাজার ৮৫ ডলার।

কিউবা বিপ্লবের পর, ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমেরিকাকে জায়গাটি ছেড়ে দিতে বার বার তাগিদ দেয়। বার্ষিক ভাড়া বাবদ অর্থ ফিরিয়ে নিতে বলে। আমেরিকানরা ক্যাস্ট্রোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। আগের চুক্তির উপর অটল থাকে। সেভাবেই দুই দেশ এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন প্রশাসন গুয়ান্তানামোকে একটি জঘন্য, গোপন জায়গায় পরিণত করেছে বিশেষ করে সন্ত্রাসী হিসেবে বন্দীদের জন্য। পেন্টাগনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বলেন, "আমাদের আইন মতে আমরা সেখানে বন্দীদের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারি... যে কোন দেশের আইনি বৈধতা ছাড়াই।"

প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০১ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিরেক্টিভ বিলে এই আইনি বৈধতা নিশ্চিত করেন। সেখানে আরো ঘোষনা করা হয়, "আল কায়েদা সন্ত্রাসীরা বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি হবে। সে আদালত সাধারণ আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।" তিনি আরো নিশ্চিত করেছেন যে, তাদেরকে বেওয়ারিশ কয়েদী হিসেবে গণ্য করা হবে কোন যুদ্ধবন্দি হিসেবে নয়। এভাবে তাদেরকে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর এভাবেই মার্কিন আইনে তাদের কারাগারে কয়েদীদের নিরাপত্তা অধিকারে নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনকেও দুর্বল করে রাখা হয়েছে।

কয়েদীদেরকে শত্রু সেনা গণ্য করার মার্কিন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আমেরিকানদেরও অবাক করেছে। অবাক করেছে মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক আইনে কয়েদীদের অবজ্ঞা করার বিষয়টি। কলিন পাওয়েল প্রশাসনকে বলেন যে, "এই কয়েদী আইন আমেরিকার শত বছরের নীতিবিরুদ্ধ। এ আইন মার্কিন সেনারা যেসব আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সুবিধা পেয়ে থাকে তার বিপরীত। এর ফলে আমেরিকার প্রতি ইউরোপিয়ান সমর্থন হ্রাস পাবে।" মার্কিন প্রশাসন তার কথায় কর্ণপাত করেননি। আমেরিকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একক কণ্ঠ।

গুয়ান্তানামোর বাস্তবতা আড়াল করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিডিয়ার সামনে বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যাপার হিসেবে, আমেরিকার সেনারা কয়েদীদের সাথে মানবিক আচরণ করবে, একই সাথে যথাযথ এবং প্রয়োজন মাফিক সামরিক কৌশলও প্রয়োগ করবে, জেনেভা আইনের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাবে।"

গুয়ান্তানামোতে থাকাকালে আমাকে এর ক্যাম্পগুলোতে অনেকবার ঘোরানো হয়েছে। যদিও সবগুলো ক্যাম্পে কিংবা সবগুলো কক্ষে আমার থাকা হয়নি। তারপরও বলার মত যথেষ্ট আমি দেখেছি। সবগুলো ক্যাম্প আর কারাকক্ষ বা সেল একই ডিজাইনের, একই মানের। এরকম স্থাপত্য নকশার পেছনে যে যুক্তি থাকতে পারে তা হলো, জেলাররা যাতে কয়েদীদের পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদেরকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের অপরাধের (!) মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে।

ছয়টি মূল ক্যাম্প রয়েছে। প্রত্যেকটির নাম্বার দেওয়া আছে। তার সাথে আরো দুটো ছোট ক্যাম্প রয়েছে। একটি ক্যাম্প ইকো আর আরেকটি জঘন্যতম ক্যাম্পের নাম ক্যাম্প এক্সরে। ক্যাম্প এক্সরেকে পরবর্তীতে ক্যাম্প ডেল্টা নাম দেওয়া হয়। ক্যাম্প এক্সরেতে তারা অত্যন্ত বিপদজনক কয়েদীদের রাখত। আর ক্যাম্প ইকোতে আমরা আমাদের আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম। এছাড়া পিছনের দিকে ৪৮টি কক্ষে রয়েছে বিভিন্ন জিনিস (যেমন খাবারদাবার, পোশাকাদি, সরঞ্জামাদি) ও সেগুলো আনা নেয়ার অসংখ্য ছোট ছোট শিপিং কনটেইনার।

ক্যাম্প-৪ ছিল সবচেয়ে সুন্দর। প্রশাসন এখানে এমন কয়েদীদের রাখত যারা মুক্তি পেতে চলেছে। এক কক্ষে আটজন কয়েদী থাকতে পারে।

কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নিই। মোটামুটি স্বাধীন। তারা একসাথে খেতে পারে, সালাত আদায় করতে পারে। অভিজাত পরিবারের মতই বাথরুমে শাওয়ার, সাবান ব্যবহার করতে পারে। এমনকি তাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে। তারা খেলতে পারে ফুটবল। পিংপংও খেলতে পারে। এটি একটি চত্বরকে ঘিরে চারটি সারিতে সাজানো ভবনের সমষ্টি যা অন্যান্য ক্যাম্পের মত গুচ্ছ, ঘন নয়।

ক্যাম্প-১ এ ছিল আটটি ব্লক। আলফা, ব্র্যাভো, চার্লি, ডেল্টা, ইকো (ইকো নাম দেখে বিভ্রান্ত হবেন না কারণ ক্যাম্প ইকো নামে একটি ক্যাম্পও রয়েছে) গলফ, হোটেল এবং অপরিচিত ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া ব্লকে শারীরিক শাস্তির সাথে মানসিক শাস্তিও দেয়া হয় সম্পূর্ন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। এখানকার কারাকক্ষগুলো উন্মুক্ত ধরনের। এক বাই দুই বর্গমিটার। স্টিলের কলাম দিয়ে পৃথক করা। কক্ষগুলোর রয়েছে ধাতব বেসিন, কট। সরু মুখ; যেখান দিয়ে আমাদের বের করা হয়।

ক্যাম্প-২ ছিল মাত্র একশ মিটার দূরত্বে। কিলো, লিমা, মাইক, নভেম্বর এবং অস্কার হলো এর একেকটি ব্লক। ক্যাম্প-৩ এর ব্লকগুলো হলো, পাপা, কিউবিক, রোমিও, সিয়েরা এবং ট্যাঙ্গো। যখন আমি প্রথম আসি আমাকে লিমা ব্লকের ৪০ নং সেলে রাখা হয়েছিল।

কক্ষগুলোতে তেমন আসবাবপত্র ছিল না। সামান্য যা কিছু আছে সেসব আবার মাসে মাসে পরিবর্তন করা হয়। সেখানে ছিল একটি ওয়ান টাইম কাপ, পানির বোতল, ম্যাট্রেস, এবং একটি সাধারণ প্লাস্টিকের মাদুর যা আমরা নামাজের জন্য ব্যবহার করি, (অনেক অনুন্নত এলাকায়) টয়লেট বানাতেও এই মাদুর ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানজনক আচরণ নতুন কারো প্রতি। পাশাপাশি একটি করে বিছানার চাদর, কম্বল, তোয়ালে দেয়া হয়।

দ্রুত আমাকে তাদের স্তর বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় ফেলা হয়। তারা প্রায়ই আমাদের আচরণের জন্য পুরষ্কার দিত ও তিরষ্কার করত। যারা লেভেল-১ এর পর্যায়ের তারা (নিজেদের সাথে প্রয়োজনীয়) সবকিছু রাখতে পারত কিন্তু যারা দুর্বব্যবহার করত (মানে, তাদের চাহিদামত তথ্য দিত না) তাদের অধঃপতন হতো। লেভেল সংখ্যা বেড়ে যেত এবং সবকিছু হারাতে থাকত।

ক্রমেই এসব মৌলিক অধিকার পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠত। কিন্তু তাদের অনুগত হলে সব পাওয়া যেত।

লেভেল-২ এ তারা আমাদের পানির বোতল, ম্যাট্রেস নিয়ে নেয়। লেভেল-৩ এ পানির বোতল, ম্যাট্রেস, কাপ এবং কম্বল নিয়ে নেয়। লেভেল-৪ এ তারা শুধু একটি কম্বল ও একটি প্লাস্টিকের মাদুর রাখে। সবকিছু নিয়ে নেয় এমনকি টুথপেস্ট, সাবানও। এরপরও তারা সন্তুষ্ট না হলে নতুন মাত্রা যোগ করত। সবকিছু নিয়ে নিতো শুধু গায়ের জামাটা ছাড়া।

জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মন্তব্যের আলোকে কয়েদীদের লেভেল নির্ণয় করা হতো। তারা লেভেল নির্ণয় করত কয়েদী তথ্য দিয়ে কতটা সহযোগিতা করেছে, কতটা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার ওপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল বিচ্ছিন্নতা। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েদীকে একটি নির্জন কক্ষে রাখা হয়। সে কক্ষটির পুরো দেয়াল কালো রং করা। এয়ার কণ্ডিশন বন্ধ। সারাক্ষণ হাজার পাওয়ারের লাইট জ্বলা। কয়েদীদের মধ্য থেকে যাদেরকে সেখানে নেয়া হয় তাদের মাথা মুণ্ডানো হয়। দাড়ি-গোঁফ পুরোপুরি শেভ করা হয়। সাথে যা কিছু আছে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়।

সৈনিকেরা আমাদের ভয় নিয়ে নির্ভয়ে কাজ করত। আমরা জানতাম তারা আমাদের উন্নতি চায়। কিন্তু কিসের উন্নতি? এই অবস্থা থেকে আরো কষ্টদায়ক স্তরে যা মৃত্যুর আরো কাছে?

গুয়ান্তানামোতে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রধান কারিগর ছিল ডাক্তাররা। তারা আরো নির্মম ও কষ্টদায়ক শাস্তির পথ বাতলে দিত মার্কিন সৈন্যদের।

তারা স্পষ্ট আমাদের বলত, "আমরা তোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দেব। কিন্তু আবার মরতেও দেব না। তোরা এই পৃথিবীতে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পরে থাকবি।"

এরা ছিল এমন ডাক্তার যারা ব্যথা আর কষ্ট নিয়ে হাজির হতো, উপশম করার জন্য নয়। মানুষকে সেবা দেয়ার ডাক্তারি শপথের সাথে তারা বেঈমানী করত। চিন্তা করতে পারেন! বছরের পর বছর এদের বাবা মা ডাক্তারি পড়ার খরচ যুগিয়েছে এই জঘন্য কাজ করার জন্য। তারা নতুন নতুন ব্যথার আয়োজন উপভোগ করে। মেয়াদউত্তীর্ণ বা ভুল ঔষধ প্রয়োগ করে। যেমন, চোখের ড্রপ কানে, কানের ড্রপ চোখে দিতে বলে।

সেখানে তিন ধরনের চিকিৎসা কষ্ট আমরা সহ্য করেছি (অবশ্য আমাদের সবাই সহ্য করে বেঁচে নেই। কেউ কেউ মারাও গেছে)।

প্রথম কষ্ট হলো, একটি জঘন্য সরল উক্তি যেটা গুয়ান্তানামোতে প্রায়ই করা হতো। সেটা হলো "ভুল চিকিৎসা" (Medical Mistakes)। আমি একবার একটা লেখা পড়েছিলাম যে, আমেরিকাতে দেড় লাখ মেডিকেল মিসটেকস হয় প্রতিবছর। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও আইনী মারপ্যাঁচের ভয় সত্ত্বেও এ ভুল হয়। অতএব, চিন্তা করে দেখুন গুয়ান্তানামোতে আমাদের অবস্থা কীরকম হতে পারে! কোন পরীক্ষা ছাড়াই ঔষধ দেয়া হতো। সম্পূর্ন মন মতলবি চিকিৎসা দেয়া হতো।

ব্রাদার আব্দাল রহমান আল মাশরির পা এমন জঘন্য ভাবে অপারেশন করা হয়েছে যে তারচেয়ে নিজে নিজে অপারেশন করলেও আরো ভাল হতো। পায়ের ১৫ সে.মি. যেখানে প্লাস্টার করার কথা সেখানে করা হয়েছে ৫ সে.মি.। বাকি অংশের গোসত ঝুলে থাকত আর ব্যথা তাতিয়ে উঠত। প্রায়ই ব্যথায় সে আধমরা হয়ে যেত।

দ্বিতীয় কষ্ট হলো, চিকিৎসায় ব্যর্থ অপারেশন বা অস্ত্রোপচার। তারা ইচ্ছা করেই ব্যর্থ হতো। একাজ করেছে তারা পাকিস্তানের ব্রাদার আনসার আল পাকিস্তানির সাথে। ভাইটি অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন শক্তিশালী ও উচুস্তরের একজন সংগঠক। তার দেহে এত বেশি ব্যর্থ অপারেশন চালানো হয়েছে যে তিনি প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছেন।

তৃতীয় যে কষ্ট চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেওয়া হয় তা হলো, তুচ্ছ কারণে অপারেশন। এ অপারেশন করা হতো মার্কিন সেনাদের মনমতো না চলার কারণে অথবা নতুন চিকিৎসকদের অনুশীলনের প্রয়োজনে। আমরান আল তাঈফীকে বিশবার অপারেশন করা হয়েছে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে। অপারেশনগুলো চালানো হতো সাধারণত পরিকল্পনামাফিক এবং হঠাৎ করে। মার্কিন সেনারা একে 'সাধারণ রুটিন মাফিক অপারেশন' বলে মন্তব্য করত।

তারা সঠিক ঔষধ না দিয়েও কষ্ট দিত। কষ্ট দিয়ে মজা পেত। গুয়ান্তানামোর নিয়ম অনুযায়ী কোন কয়েদীকে একজন জেলার ঔষধ নাও দিতে পারবে যতক্ষণ না সে মনে করে কাংখিত গোপন তথ্য সে পায়নি। কয়েদী যত অসুস্থই হোক না কেন জেলার ইচ্ছা করলে হাসপাতালকে বলে

দিতে পারে তার চিকিৎসা না করাতে। কয়েদী ব্যথায় চিৎকার করতে থাকবে, চিকিৎসার জন্য মিনতি করতে থাকবে তখন ডাক্তার বলবে, তোমার জেলার বা তদন্ত কর্মকর্তাকে আগে রাজি করাও!

এ ঘটনা ঘটেছে ব্রাদার আলী আল ওয়াইলীর সাথে। তার দুই কান ব্যথায় টনটন করছিল কিন্তু চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। আমি আপনাকে প্রশ্ন করি প্রিয় পাঠক, আপনি সে ব্যথার কথা কল্পনা করুন। তাকে ব্যথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখেছি। তিনি ব্যথায় বসে থাকতে পারছিলেন না। মার্কিন সেনারা শুধু বলত, "তোমার তদন্তকারীকে বলো।"

বলতে কষ্ট হচ্ছে যে কয়েদীদের চিকিৎসা না দেওয়ার চাইতেও নিষ্ঠুর আরেক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করে। সেটা হলো কয়েদীদের মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া। তারা এটা করে দু'ভাবে।

১. অসুস্থ কয়েদীকে তারা নারকোটিক নামক একটি মাদক দ্রব্য দেয়। আসক্তি না আসা পর্যন্ত দিতে থাকে। এরপর এক পর্যায়ে বন্ধ করে দেয়। একে নির্যাতনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারা এটা যে কারো সাথেই করতে পারে। বিশেষ করে যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে বলে মনে করে। আমি এরকম একজন আসক্ত কয়েদীকে দেখেছি। যে তার সেলের ভিতর চরকার মতো চারদিকে ঘুরত। নেশার ঔষধ না দেওয়া পর্যন্ত সে ঘুরতে থাকত। নিশ্চিতভাবে সে তাদের সব তথ্যই দিয়েছে যা সে জানত। অথবা যা জানতে চেয়েছে সবই বলে দিয়েছে।

২. অধিকাংশ কয়েদীদের জোরপূর্বক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করানো হতো। কয়েদীরা যাতে কারাগারে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, কোন প্রতিবাদ করতে না পারে। এক কয়েদীকে ছয় মাস পর্যন্ত পাগল করে রাখা হতো। সে দিন রাত বুঝত না। কাউকে চিনতে পারত না। সে তার কক্ষেই পরে থাকত। শুধু পাগলের প্রলাপ বকতো।

কারাগারে ভাইয়েরা নিরবে এসব নির্যাতন সহ্য করে যেত। কাউকে বলত না। পাশের কয়েদীকেও বলত না তার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে। কী যন্ত্রণা সে সহ্য করে যাচ্ছে। এ কষ্ট তারা সহ্য করে যেত শুধু অপর ভাইদের ঈমান দুর্বল হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে। এমনকি তাদের সহমর্মিতা, সমর্থন যখন প্রয়োজন হতো তখনও তারা নিরবে সয়ে যেত।

‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত

মাঝে মাঝে আমি ভাবি। ভাবনায় ডুব দিই। কিভাবে শুরু হলো এই যাত্রা। স্মৃতির ডায়েরি খুলে যায়। পৃষ্ঠা ওল্টায়। এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে মনে। দেহের ব্যথা আমি ভুলে যাই। কিন্তু মন মুনিয়ার যাতনা বেড়ে যায় বহুগুণ।

আফগানিস্তানে আমার প্রথম নিয়োগের কথা মনে পড়ে। আমাদেরকে সেখানে আমেরিকার ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহে পাঠানো হয়। প্রথমে আমরা পাকিস্তানে আসি। এরপর সেখান থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। আমাদের প্রথম অবতরণ ছিল করাচী; ইসলামাবাদ যাওয়ার ফ্লাইটে সেখানে অবতরণ করেছিলাম। ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে কাতার এম্বেসীর একদল অভ্যর্থনাকারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আমাদের এম্বেসীতে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে আরো অনেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষামান। এর মধ্যে আছেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ ফালাহ। তারা আমাদেরকে তাদের সাথে খাবার খেতে দাওয়াত করে। দাওয়াত দেয় আরব আতিথেয়তার নিয়মে। খাবার কক্ষে গিয়ে দেখি বিশাল ডাইনিংয়ে আস্ত ভেড়ার রোস্ট। পাশে আরব্য কফির বিশাল পাত্র।

খাবারের পর নিকটস্থ হোটেলে গিয়ে উঠি। সেখানে আমাদের অনেক সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সহকর্মী আল জাজিরার প্রতিনিধি আহমাদ জায়দান সেখানে ছিলেন। জায়দান আমাকে টানা তিন দিন সঙ্গ দেন। আফগানিস্তানের ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করেন।

আমার মনে পড়ে সে সময় রাষ্ট্রদূত ছিলেন আব্দুস সালাম যাঈফ। যিনি পরবর্তীতে গুয়ান্তানামোতে আমার বন্ধু হয়েছিলেন।

পাকিস্তানে থাকাকালে সেখানকার চমৎকার উর্দু ভাষার শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। রাস্তায়, অলিগলিতে মানুষের সাথে কথা বলতে আমার ভাল লাগত। ভাল লাগত বিরিয়ানী, চিকেন ভোজ আর মশলা মেশানো কালো চা পান।

ভারতীয় উপমহাদেশে আমি একেবারে নতুন নই। যদিও পাকিস্তানে আমার তেমন চেনাজানা নেই। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পার করেছি ভারতে। যার অভিজ্ঞতা আমাকে এই মাটি ও মানুষের বৈচিত্র সম্পর্কে সমৃদ্ধ করেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাস আর সমৃদ্ধ সভ্যতার মিশেলে এক বিস্ময়কর সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমি সত্যিই ভারতের মানুষ ও দেশটাকে ভালোবাসি। ভারত আমার জীবন গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অংশীদার।

একপর্যায়ে আমরা আমাদের ভিসা পাই। কোয়েটার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ত্যাগ করি। সেখানে হাসান আল রাশিদীর সাথে সাক্ষাৎ করি। সেখানে একটি হোটেলে ওঠি যেখানে সব বিদেশি সাংবাদিকরা ওঠে। আমাদের সাথে সিএনএনের এক সহকর্মীও সেখানে ছিল।

সিএনএনের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছি চুক্তিবদ্ধ হয়ে। সিএনএন উত্তর আফগানিস্তানের নিউজ কভার করত আল জাজিরার জন্য আর আল জাজিরাও কাবুল ও অন্যান্য এলাকার নিউজ কভার করে সিএনএনকে দিত। কান্দাহারে সিএনএনের একটি ভবন ছিল যেখানে তাদের এক প্রতিনিধি থাকত। কিছু দিনের জন্য আমরা সেখানে থাকার পরিকল্পনা করি।

আমরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করি স্থল পথ দিয়ে। প্রথমে শামান পরে বলদাক যাই। জায়গাটি আমার জন্য আফগানে ঢোকার যেমন প্রথম স্থান তেমনি গুয়ান্তানামোতে যাওয়ারও প্রথম স্থান।

আফগান বর্ডারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কারি সাহিব। আমাদের আফগান গাইড। আরবিতে কথা বলেন। সে রাতে আমাদের কান্দাহার নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। গুয়ান্তানামো থেকে বের হবার পর আমি জানতে পেরেছি কারি সাহিবকে হত্যা করা হয়েছে। সে রাতে তার সন্তানেরা আমাদের সাথে ছিল। তারা আজ ইয়াতীম।

আমরা যখন কান্দাহারের সদর দরজায় এসে উপস্থিত হই তখন আকাশে বিমান টহল চলছিল। নগরীর বিমান বন্দর থেকে বিমানগুলো শাঁ শাঁ করে উড়ে আসছিল। আমার মনে পরে, আমাদের সহকর্মী ইউসুফ আল সোমালী যখন কান্দাহার এয়ারপোর্ট থেকে লাইভ করছিল। তখন এয়ারপোর্টে হামলা হয়েছিল। সেটাই ছিল কান্দাহার থেকে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক মিডিয়া কাভারেজ।

আমরা সিএনএন সংবাদ মাধ্যমের ভবনে থাকতে শুরু করলাম। কান্দাহার থেকে প্রতিদিন আপডেট দেয়ার কাজ চলতে থাকে। সংবাদের ফোকাস ছিল সে সময় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের খবর। কান্দাহারকে তখন তালেবানের রাজধানী বলা হতো। যুদ্ধাঞ্চল হওয়ায় আমাদের চলাচল ছিল সীমিত।

একদিন আমরা ছিলাম বাসার বাইরে। বাজারে কিছু ছবি তোলা, ভিডিও করার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় তালেবানরা আমাদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। তারা আমাদের সারা দিন আটকে রাখে। কাগজপত্র চেক করে দেখে আমরা সত্যি আল জাজিরার সাংবাদিক কিনা। সন্ধ্যার দিকে তারা আমাদের মুক্তি দেয়। বলে দেয় তাদের অনুমতি ছাড়া যেন বাসার বাইরে না যাই। আমরা বাসায় ফিরে আসি। কাজে নেমে পড়ি। বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন বিমানটহলের খবর সংগ্রহ করি।

কান্দাহার একটি পশতুন শহর। কাবুল ও হেরাতের পর তৃতীয় বৃহত্তম আফগান নগরী। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত নগরীটি কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে দেখা যায়, আগেকার সফল শাসকগণ এই নগরীকে দখলে রাখতে ভুল করতেন না।

এর নাম নিয়ে নানান মত রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী, নামটি নেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী আফগান কাশ্মীর সীমান্তে গান্দাহারা রাজ্যের নাম থেকে। আরেকটি মত অনুযায়ী, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নামানুসারে কান্দাহার নামকরণ হয়। যিনি এই নগরীকে পুনরুজ্জীবন দান করেন। এবং এশিয়ার এই শহরে তার শাসনের চিহ্ন রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করতেন।

আব্বাসীয়দের যুগে ইসলাম আসে কান্দাহারে। আরব শাসকদের প্রভাব শুরু হয়। সুদৃঢ় হয়। এরপর তুর্কীদের শাসন আসে। ১৮ শতকে এটি আফগানের রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পায় পশতুনদের উত্থানের সাথে

সাথে। কিন্তু অচিরেই কাবুলের কাছে এর জৌলুস ম্লান হয়ে যায়। এখন কাবুল রাজধানী।

যদিও আমেরিকানরা বিশ্বকে জানিয়েছে যে তাদের বিমান টহল সাধারণ মানুষের জন্য হুমকি নয় কিন্তু তাদের অধিকাংশ বোমা নিক্ষেপ ঘটেছে বেসামরিক মানুষের ঘরবাড়ির উপরই। হাসপাতালে শিশুরা কাতরাচ্ছে। বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু সাধারণ মানুষও। একটি দৃশ্য আমি দীর্ঘ দিন বয়ে বেড়িয়েছি যে, একবার একটি জ্বালানী ট্রাকে যখন বোমা হামলা হলো তখন চালকসহ গাড়িটি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ড্রাইভার ভিতরে ছিল। বের হবার সুযোগ পায়নি। তার শরীর এমনভাবে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে চেনার উপায় থাকল না। ঘটনাটি ঠিক আমার সামনেই ঘটে। কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। ঘটনাটি দীর্ঘদিন আমার স্মৃতিপটে একটি কষ্টের স্মৃতি হয়ে থাকে।

আরেকদিন, এক তালেবান সেনা আমাকে একটি বিমান হামলার ব্যাপারে বলে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কান্দাহারের একটি গ্রামে। আমরা দুইঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ঘটনাস্থলে কী ঘটেছে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম পুরো একটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান থেকে এমনভাবে বোমা ফেলা হয়েছে একটি কবরস্থান, মসজিদও অখণ্ড নেই।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। তার নিচে চাপা পরেছে অজস্র কান্না। গ্রামবাসীদের অনেকে গিয়েছিল জীবিকার সন্ধানে। নিরিবিলি গ্রামে নিরাপদে রেখে গিয়েছিল স্বজনদের। কিন্তু এসে দেখে এক বিধ্বস্ত গ্রাম। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত স্বজনদের দেহ নিথর পড়ে আছে। তারা বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে এনে কবর দেয়। সেখানে এক বৃদ্ধ কাঁদছিল। কী হয়েছে জানতে চাইলাম। বললেন, পাশের বাজারে গিয়েছিলেন কিছু জিনিস বিক্রি করে প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে। এসে দেখেন পরিবারের স্ত্রী, সন্তান নাতী-নাতনীসহ আঠারো জনের সবাই মরে পড়ে আছে।

আমি একজন দোভাষীর মাধ্যমে তার সাথে কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে ওই বৃদ্ধ আমাদেরকে তার নাতী যে খেলনা বিমান দিয়ে বিছানায় খেলত তা দেখাতে নিয়ে যায়। দোভাষী আমাকে বলে যে বৃদ্ধটি বলছিল,

'কী অপরাধ করেছিলাম আমরা যে আমাদের পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলতে হবে? কী আমাদের অপরাধ যার দরুন আমার দুধের শিশুর এই পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান হবার আগেই পৃথিবী ত্যাগ করতে হলো? কেন এই গ্রামে হামলা? বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের উত্তর ছিল-এই গ্রামে প্রতি বুধবার হাট বসে। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই সমাগম দেখে মার্কিন সেনারা ভয় পেয়ে যায়। তারা মনে করে এটা তালেবানদের সমাবেশ। তারা নিশ্চিত না হয়েই সাধারণ নিরীহ দরিদ্র মানুষের উপর বোমা হামলা শুরু করে। আমরা সে গ্রামের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে আল জাজিরায় পাঠিয়ে দেই।

যখন মাগরিবের সালাতের সময় হলো আমরা ইমাম সাহেবকে সালাত শুরু করতে বললাম। কিন্তু তিনি শরীর ভাল না লাগার কথা বললেন। আমরা মেনে নিলাম। আমাদের সহকর্মী ইউসুফ সালাত পড়ালেন। সালাত শেষে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেমন বোধ করছেন, কেন তিনি ইমামতি করতে পারলেন না। তিনি বললেন তিনি এরকম আর কখনো বোধ করেননি। এই প্রথম একজন তার কাছে সাহায্য চেয়েছে আর তিনি সাহায্য করতে পারেননি।

আমি তাকে বললাম ঘটনা খুলে বলতে। তখন তিনি বললেন, আপনার কি মনে পড়ে আপনি যখন একজন লোকের সাক্ষাতকার নিচ্ছিলেন তখন আপনার পাশে আরো কিছু লোক কাঁদছিল এবং আপনার সাথে কথা বলছিল?

"তারা বলছিল যে বিমানগুলো যখন গ্রামটিকে ঘিরে বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তখন পাহাড়ের পাদদেশেও কিছু বসতি ছিল। সে বসতিগুলো এখন পাথর চাপা পড়েছে। গ্রামের সে লোকটি চাচ্ছিল কেউ একজন তাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে তার পরিবারের লোকদের মৃতদেহ উত্তোলনে সাহায্য করুক। যাতে সে তাদের কবরস্থ করতে পারে।"

আমি ইমাম সাহেবকে কথা দিলাম পরদিন ফজরের নামাজের পর আমরা তার সাথে সেখানে যাব। হতভাগা লোকগুলোর শেষ পরিণতি কী হয়েছে দেখব। ছবি, ভিডিওসহ পুরো ঘটনার বিবরণ নিউজ করব। পরদিন ভোরে শপথমত বেরিয়ে পরলাম। গ্রামের বন্ধুর পথ ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি থামিয়ে দিতে হলো। পায়ে হাঁটলাম প্রায় দু'ঘণ্টা। আমি গ্রাম্য উঁচুনিচু পথে হাঁটতে কিংবা হিমালয়ের হিমশীতল পথে গাড়ি চালাতে, হাঁটতে অভ্যস্ত না। আমি হাঁপাচ্ছিলাম তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম হাঁটতে, পায়ের জোর ধরে রাখতে।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই আমরা দেখি রকেটের কাটা, মার্কিন সেনাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় সৃষ্ট হওয়া বিশাল গর্ত। গর্তটিতে একজন আস্ত মোটাসোটা মানুষ পুঁতে রাখা সম্ভব। বোমার আকার ও পরিমাণ দেখে আমি খুবই অবাক হলাম। কত কত টন বোমা তারা তৈরি করেছে কত কত বিস্ফোরক দ্রব্য লেগেছে এসব বানাতে। এই বিধ্বংসী বোমা তারা নিক্ষেপ করছে এসব গ্রাম্য মানুষের উপর!

আমরা হাঁটতে লাগলাম। গ্রামের যত ভেতরে যাচ্ছি ততই বড় বড় গর্ত দেখতে পাচ্ছি। এক পর্যায়ে গিয়ে দেখি শুধু পাথর। এক নজর চোখ বোলালেই আসলে বোঝা যায় যে এরা একরকম যাযাবর, গুহাবাসী। তাদের না আছে আমেরিকান সেনাদের মোকাবিলা করার শক্তি। না আছে তালেবানদের সাথে কোন সম্পর্ক। এই প্রচণ্ড শীত কবলিত গ্রামে মানুষজন বোমার ভয়ে কাঁচা মাটিতে গর্ত করে থাকছে। উন্নত রুমহিটার সমৃদ্ধ বাড়ি বাদ দিয়ে। অনেকটা সৈনিকদের তাঁবুর মত দেখতে সেসব ঘরবাড়ি। মার্কিন সেনারা এসব তাঁবুর মত ঘরবাড়িকে তালেবানদের আস্তানা ভেবে বোম্বিং শুরু করে। নিরীহ মানুষগুলোকে মারতে শুরু করে।

কাবুল দখল করে আমেরিকানরা হেরাত দখলের জন্য এগোতে থাকে। বোম্বিং করে করে দখল করে নেয়। এরপর নজর দেয় কান্দাহারের দিকে। মার্কিন সেনারা কান্দাহার শহরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে। প্রতিদিন অসংখ্য বেসামরিক মানুষ বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা যায়। নারী, শিশু, বৃদ্ধরাই বেশি। শহরের প্রধান হাসপাতাল চাইনিজ হাসপাতাল তখন জনাকীর্ণ হয়ে উঠে।

সেই রাতে কান্দাহারে ঘুমাইনি। সারারাত বাইরে ছিলাম। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সকালে ফিরে এসেছি যদিও তখন বাইরে বোম্বিং হচ্ছিল। অবস্থা আরো খারাপ হলো যখন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো। তখন শুধু ওই চাইনিজ হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও কোন আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। তাই আমরা চ্যানেলে নিউজ পাঠাতে সেখানে গেলাম।

এই কঠিন মুহূর্তে বরকতের মাস রমাদান এসে পড়ে। কিন্তু সেবার রমাদানের প্রথম দিনেই আমরা তালেবানদের থেকে শহরের দখল ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা শুনি। আমাদের আফগান দোভাষী আমাদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। তার সোজা কথা, "যদি তালেবান চলে যায় তবে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। আফগানীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে।" আমি এখনো তার সে কথা স্মরণ করতে পারি। সে বলেছিল, "সামি, আপনি আফগানদের চেনেন না। যখন তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তারা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আমি আপনাকে একটিই পরামর্শ দেব-আপনি কান্দাহার ত্যাগ করুন।"

তাই আমরা রমাদানের প্রথম দিনেই কান্দাহার ত্যাগ করি। ইউসুফ আল সোমালি, ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম নাসার এবং আমি। আমরা বলদাকের সীমান্ত অঞ্চলে যাই। সেখান থেকে চামান এবং কোয়েটাতে।

তালেবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের বিশেষ সচিব তাইয়্যেব আগার বলদাকে একটি প্রেস কনফারেন্স করার ঘোষণা দেওয়ায় আমরা কোয়েটাতে কয়েকদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিই। তাই অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে আমরাও সাংবাদিক সম্মেলন কভার করতে থেকে যাই।

বলদাকে আমাদের আফগান উদ্বাস্তুদের দেখার সুযোগ মেলে। আরো একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। অত্যন্ত তিক্ত সে অভিজ্ঞতা। বলদাকে আমরা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে যাই। বছর বিশেকের একজন নারীর দিকে চোখ আটকে যায়। সে তার সন্তানদের মাঝে বসে ছিল। বসে বসে তিনি কাপড় ধুচ্ছিলেন। কর্দমাক্ত পানিতে। কোন সাবান ছিল না। এক হাতে কাপড় ধোয়া আরেক হাতে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। তার পাশে তিন বা চার বছরের এক ছোট বালক দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

আমার কাছে মনে হয়েছে, এই দৃশ্যটিই আফগানিস্তানের চিত্র। আমি তার অবস্থা ভিডিও করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি পৃথিবীকে জানাতে চাই এখানে কী পরিস্থিতি চলছে। দেখাতে চাই আমেরিকার যুদ্ধে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থা কি রকম। আমেরিকার বোমা বর্ষণে কতটা বিধ্বস্ত হয়েছে আফগান জনপদ। অথচ মার্কিনিরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা বিশ্ব শান্তি, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সুরক্ষাদাতা।